ধাঁ ধা কা ব্য

আয়নাঘর

ঝর্না রহমান

ঐতিহ্য

উত্তর প্রজন্মের ধাঁধাপ্রিয় নাতি-নাতনির উদ্দেশে–
যারা হয়তো খুঁজবে হারিয়ে যাওয়া এক কাজলা দিদিকে।

প্রসঙ্গকথা

ছোটবেলায় যতীন্দ্রমোহন বাগচী রচিত 'কাজলা দিদি' কবিতায় একটা লাইন পড়তাম, 'মাগো, আমার শোলোক-বলা কাজলা দিদি কই।' তখন আমাদের শৈশব ছিল রঙিন আর গল্পমুখর। সমবয়সী বা মুরুব্বি যাকেই পাই, ধরে বসি গল্প আর শোলোক বলার জন্য। নাওয়া-খাওয়া ভুলে শুনতাম সুয়োরানি দুয়োরানি, রাখালের পিঠাগাছ–এমন আরও কত রূপকথা-উপকথা আর বিচিত্র গল্পগাথা! তবে গল্পের চেয়েও উপভোগ্য ছিল শোলোক বা শ্লোক। কারণ গল্প শুধু নির্মল আনন্দ দেয়, কখনো চরিত্রের সুখ-দুঃখে আনন্দিত বা বেদনার্ত করে, কিন্তু শোলোক মস্তিষ্কের ব্যায়াম করায়। বুদ্ধিকে শান দিতে শেখায়। ভাবনাকে বিস্তৃত আর ক্ষুরধার করে তুলতে সাহায্য করে। তাই শোলোক ছিল দারুণ মজার বিষয়। কতরকম শোলোক বা ধাঁধায় ভরা ছিল আমাদের গ্রামবাংলার কথকিয়া জীবন! পল্লিসাহিত্যের এই রত্নসম্ভার আধুনিককালে এসে হারিয়ে গেছে। বই-পুস্তকে কিছু সংরক্ষিত থাকলেও মানুষ আর তার চর্চা করে না। এমনকি গ্রামগঞ্জের লোকজীবন থেকেও হারিয়ে গেছে ধাঁধা। এই ভূমিকা করার উদ্দেশ্য আমাদের সাহিত্যে লোকজ ধাঁধার একটা প্রেক্ষাপট তুলে ধরা।

প্রথমেই বলে নিই, আমার এ-বই 'ধাঁধাকাব্য আয়নাঘর' কোনো লোকজ ধাঁধার সংকলন নয়। এখানে সম্পূর্ণ নতুন রচিত ৪১টি ধাঁধা রয়েছে। প্রতিটি কবিতায়, এ ধাঁধাগুলো ছড়ার আদলে লিখিত হলেও এগুলো এক অর্থে কবিতাই–কারণ লোকজ ধাঁধা বা শোলোকের ছড়াগুলোতে সহজসরল শব্দের রহস্যের আড়ালে কোনো একটি জিনিসের নাম লুকিয়ে থাকে, তার উত্তর বের করাটাই আসল কথা। সেখানে কাব্যসৌন্দর্য কখনও কখনও থাকলেও তা সাধারণত প্রধান হয়ে ওঠে না। শোলোক রচনাকারীগণও পল্লির সাধারণ মানুষ। তাঁদের সহজিয়া জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়, প্রকৃতি, এসবই শোলোকে প্রহেলিকার আবরণ তৈরি করে। কবিতার পঙ্‌ক্তিমালায় বাক্যের যে অন্তর্গত রূপ থাকে, শব্দের সৌন্দর্য, অর্থের বিস্তার, ধ্বনিমাধুর্য, অলংকারের ব্যঞ্জনা, রূপক ও চিত্রকল্পের প্রয়োগে যে এক নান্দনিক ভুবন সৃষ্টি হতে পারে, পাঠকভেদে সৃষ্টি করতে পারে ভিন্ন ভিন্ন অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের জগৎ, লোকজ ধাঁধায় তা খুব একটা থাকে না বললেই চলে। 'ধাঁধাকাব্য আয়নাঘর'-এর বৈশিষ্ট্যই

এখানে। এর একচল্লিশটি কবিতায় শুধু ধাঁধার চমৎকারিত্ব এবং শব্দ-বাক্য-উপমা রূপক চিত্রকল্পে রহস্যের নান্দনিক প্রহেলিকাই তৈরি হয়নি, চেষ্টা করেছি প্রতিটি লেখায় কাব্যসৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে। তবুও এর মূল পরিচয় 'ধাঁধা'-ই। এখানে প্রত্যেকটি ছড়ার মধ্যেই লুকানো আছে একটি বিষয়, বস্তু বা কোনো দৃশ্যপরম্পরার সংকেত। তারপরও আমার বিশ্বাস, এ লেখাগুলো পাঠককে ধাঁধা হিসেবে বুদ্ধিতে শান দেওয়ার পাশাপাশি কাব্যের নন্দনকাননে ঘুরে বেড়াবার আনন্দও প্রদান করবে।

এখানে বেশিরভাগ ধাঁধা-ই আমি রচনা করেছি প্রচলিত ছড়ার ছন্দে বা লোকছন্দে। শব্দ ব্যবহারেও লোকজ রীতির মধ্যদিয়ে গ্রামীণ আমেজ ধরে রাখতে চেয়েছি। এজন্য সচেতনভাবে সাধু-চলিতর মিলমিশ করে দিয়েছি। কোনো কোনো ধাঁধায় পর্ব বিন্যাস ও স্তবক বিন্যাসে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছি। লোকজ ধাঁধার কোনো কোনো বিষয়ও নতুন রহস্যে, নতুন বিন্যাসে, নতুন বুননে রচনা করেছি। আধুনিককালে আমাদের অতীত জীবনে যাপিত বিষয়ের অনেক কিছু হারিয়ে যাচ্ছে বা গেছে– যেগুলো কিনা এখনকার প্রজন্ম চিনবেও না। লোকসাহিত্যে এমন অনেক বিষয় নিয়ে শোলোক আছে, যেমন ঢেঁকি, সরতা, মই, গোলা, কুপি, মাটির চুলা ইত্যাদি। এসব বিষয় নিয়ে এ-বইয়ে কোনো ধাঁধা নেই। কারণ এসব চেনার জন্য যে শব্দ সংকেত দেওয়া হবে তা বিশ্লেষণ করে ঐ জিনিসটি তাদের পক্ষে খুঁজে বের করা কঠিন হবে। তারপরেও লোকজীবনের অনেক পরিচিত বিষয় নিয়ে ধাঁধা আছে। যেমন জাল, তাঁত, পানসুপারি, নৌকা, পাল ইত্যাদি। ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতার মিথস্ক্রিয়া ঘটানোর একটা প্রচেষ্টা করেছি। এজন্য আছে প্রবাদ-প্রবচন-বাগধারার প্রয়োগ। রূপকথা, লোকবিশ্বাস, কাব্য-সাহিত্য-সংগীত থেকে চয়ন, লোকছড়ার ব্যবহার, চর্যাগীতি-বাউলগীতি থেকে ব্যবহার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ছড়াগুলোকে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করে আধুনিক ধাঁধায় পরিণত করার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন ধাঁধায় পাঠক এ ধরনের অনেক প্রয়োগ দেখতে পাবেন। কয়েকটি ব্যবহারের কথা বলতে পারি। যেমন–

প্রবাদ ও বাগধারা: আগুনে ঘি, ঘিত্ত পড়ে অনলে, গাঙ্গে গাঙ্গে দেখা হলেও বোনে বোনে হয় না, কচু খেলে কাইজ্জাখোরের গলা চুলকায়, পুড়বে নারী উড়বে ছাই/ তবে নারীর গুণ গাই, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই/ পাইলে পাইতে পারো মানিক রতন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল, উর মাটি চুর করে, মাথা বিকিয়ে দেওয়া, দোলনা থেকে কবরে, ছিদ্রান্বেষী, কলির কেষ্ট, ছলাকলা চৌষট্টি কলা।

রূপকথা ও লোকবিশ্বাস বা মিথ: চরকা বুড়ি, চাঁদের বুড়ি, বাবুইয়ের বাসা খুলতে পারলে সোনার সুই পাবে, বেহুলার বাসর।

লোকছড়া: হাট্টিমাটিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান।

বাউল গানের বাণী: সাড়ে তিন হাত লম্বা দেহ আধখানা তার ফাড়া (আলাউদ্দীন বয়াতি), বাউল কালুশাহ ফকিরের নিরীখ বান্ধ রে দুই নয়নে।

কাব্য ঐতিহ্য: চর্যাপদের আপনা মাংসে হরিণা বৈরী, কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল, লুইপা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কান্না হাসির দোল দোলানো, ধানের শীষে শিশির বিন্দু, জীবনানন্দ দাশের হৃদয়ে ঘাস ঘাস হৃদয়, জসীম উদ্‌দীনের আসমানী, নকশী কাঁথার মাঠ, এই এক গাঁও ওই এক গাঁও।

হিন্দু পুরাণ: সীতা, হরধনু, মেঘ বৃষ্টি বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, রাধাকৃষ্ণ।

বিদেশি সাহিত্য সংগীত ইত্যাদি থেকে চয়ন: ইংরেজি শব্দ এপিটাফ, হিন্দি গান ইচক দানা বিচক দানা দানার উপর দানা, আরব্য রজনীর গল্প আলীবাবার চরিত্র বাবা মোস্তফা ইত্যাদি।

এবারে বইয়ের শেষে 'শব্দসংকেত ও রূপকার্থ' বিষয়ে কথা। ধাঁধাগুলো প্রথমে আমি ধারাবাহিকভাবে ফেসবুকে প্রকাশ করছিলাম। পাঠকদের কাছ থেকে বিপুল সাড়াও পাওয়া গিয়েছিল। একটি ধাঁধা পড়ে পাঠক আবার পরবর্তী ধাঁধার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করতেন। এতে বোঝা গেছে আমাদের কৌতূহলপ্রবণ রহস্যপিয়াসী মন এখনও মরে যায়নি। অনেকেই শুদ্ধ উত্তর দিতেন। কেউ কেউ আবার চমৎকার ব্যাখ্যা করতেন। ধাঁধাগুলোকে বই আকারে পাওয়ার জন্য অনেক পাঠকই আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন। বইয়ের আগ্রহ আমারও হলো। প্রথমে ভাবলাম বইয়ে শুধু ধাঁধাগুলোই থাকবে, তার কোনো উত্তর দেওয়া থাকবে না। পাঠক বুদ্ধি খাটিয়ে উত্তর খুঁজে নেবেন। উত্তর দেওয়া থাকলে কেউ কেউ হয়তো বেশিক্ষণ ভাববেন না, উত্তর দেখে নেবেন। কিন্তু পরে এ ভাবনা বাদ দিলাম। কারণ একসময় দেখলাম কোনো পাঠক ধাঁধার ভুল উত্তর দিচ্ছেন বটে, সেটা স্বাভাবিকও, তবে কেউ কেউ আবার এক জিনিসকে আর এক জিনিস ভেবে বসতেন, এবং দিব্যি যুক্তি দিয়ে সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যেতেন। যেমন রূপচাঁদা মাছকে কেউ ইলিশ মাছ উত্তর করলেন, কিংবা নখকে হাত। তখন মনে হলো সরাসরি শুদ্ধ উত্তর না দিলেও, বরং প্রতিটি ধাঁধায় ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ শব্দসংকেত ও রূপকার্থ দিয়ে দেওয়া দরকার। তা না হলে কোনো কোনো পঙ্‌ক্তি বা শব্দের অর্থান্তর কিংবা ভ্রান্তি ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যেতে পারে। যেহেতু এ ছড়াগুলো শেষ পর্যন্ত ধাঁধাই, প্রথাগত কবিতা নয়, ধাঁধা হিসেবে এর আছে একটা নির্দিষ্ট উত্তর। কবিতা হলে পাঠকভেদে বিভিন্ন জনের মনে একই কবিতার নানারকম অর্থ প্রতিবিম্বিত হতে পারে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, কবিতার উপমা-রূপক-চিত্রকল্প-রূপকল্প, মিথ, ঐতিহ্য ইত্যাদির অর্থ, ইতিহাস ও ধ্বনিব্যঞ্জনা– এসব বিষয়ে অত্যন্ত ধাবমান বর্তমান এবং প্রযুক্তির এই যুগে অনেক পাঠকেরই যেন নান্দনিক অন্বেষণের আগ্রহ নেই। সহজ ভাবনাই গ্রস্ত করে রাখে। কখনও হয় ভুল কিংবা বিকৃত ব্যাখ্যাও।

জীবনের সাথে ইতিহাস ও সমাজে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা, আন্দোলন-সংগ্রাম, বিপ্লব-বিদ্রোহের সম্পর্ক অনেক নিবিড়। এ বইয়ের কোনো কোনো ধাঁধায় পাঠক এমন কিছু ঘটনার সংকেতও পাবেন, যেমন– রাজা রামমোহন, তাঁর সতীদাহ প্রথা রদ, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ, বঙ্গবন্ধুর নারিকেল গাছ লাগানোর পরামর্শ,

রূপ কানোয়ার– ১৯৮৭ সালে রাজস্থানের যে অষ্টাদশী তরুণী বধূকে নির্মমভাবে সতীদাহের নামে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ইত্যাদি।

আয়নাঘর বা আয়নামহল কিংবা শিশমহল যে নামেই ডাকি না কেন, সেখানে দাঁড়ালে যেমন চারপাশ থেকে একটি দৃশ্যের অজস্র প্রতিবিম্বের একটি জাদুময় জগৎ তৈরি হয়, কোথায় শুরু কোথায় শেষ বোঝা যায় না, তারপর বুদ্ধিমানেরা বের করে ফেলতে পারেন কোথায় আছে বের হবার পথ আর কোনটি আসল, ধাঁধাকাব্যটির নাম 'আয়নাঘর' রাখা হলো সেই দৃশ্যকল্প চিন্তা করেই। আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় এ ধরনের প্রয়াস আর কেউ করেছেন কিনা আমার জানা নেই। তবে তার জন্য কোনো কৃতিত্ব নেবার কথা আমি চিন্তাও করি না, কারণ আমি তো লোকবাংলার এক নারী-উত্তরসূরি আর লোকজ ধাঁধা শুনে বড় হওয়া এক ক্ষুদ্র কবিতাকর্মী। অনুজদের জন্য উত্তরাধিকারের গৌরব তো এটাই!

ঝর্না রহমান
বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা ১২২৯
৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

সূচি

মরিচ তো নয় ঝাল লাগে ১৩
তেল চুকচুক কৃষ্ণ নারী মুখখানি তার গোল্লুগাল ১৪
আগায় ছিদ্র পাছায় ছিদ্র ছিদ্র আরও বেশি ১৫
ঘুম ভেঙে যেই সুয্যিঠাকুর লাল রং নেয় গুলিয়ে ১৬
বন বিরিক্ষি অরণ্যেতে বিশাল দেহ তার ১৭
বাওবাতাসে নায়ের বাদাম থাকতে পারে খাড়া ১৮
পুবেও জল পশ্চিমে জল ডাইনে বাঁয়ে জল ১৯
ডানটি কেঁদে বলে, ওরে বোনটি আমার বাম ২০
চিমটি দিয়া ধরছিলাম গো কইন্যা কোথায় হারালো ২১
জলে থাকেন পদ্মপাতা, পদ্মপাতায় জল, ...২২
তারা ঝিকমিক তারা ঝিকমিক তারার বাড়িঘর ২৩
মায়ের কোলে জন্ম নিলো ঘোমটা ঢাকা ঝি ২৪
চাঁদের বরণ চাঁদের গড়ন পুন্নিমারই চান ২৫
আল্লার কী শান ২৬
নাম রাম-শাম-যদু-মধু, মধু চতুষ্টয় ২৭
আমায় তুমি ছিন্ন করো ২৮
লোহাও না পিতলও না নামেতে ধাতু ২৯
জন্ম নিল মাইয়া ৩০
সোনাও নয়, রুপাও নয়, নয় সে হীরার খনি ৩১
চুনের দেয়াল নুন ধরে না আজব একখান ঘর ৩২
একই ঘরে বসত করি চার বোন এক ভাই ৩৩
সীতা সতীর পরম পতি চোখ ঘুরায়া কয় ৩৪
আসমানেতে রাইতে দিনে চন্দ্র সুরুজ ওঠে ৩৬
এক নালে এক পদ্মকলি নালেই জীবন তার ৩৭
অগ্নিগিরির লকলকে জিভ আগুন লালে জ্বলে ৩৮
ও তাঁতি তোর তাঁত কই? ৩৯

উড়াইয়া ছাই খোঁজো মানিকরতন.....৪০
হাট্টিমাটিম টিম.....৪১
বনের কাষ্ঠে হালকা দেহ মাথা বহুত ভার.....৪২
দেখতে শুনতে একইরকম যমজ দুটি ভাই.....৪৩
ছাঁটিয়া করিলে ছোট জামার আকার.....৪৪
বনস্থলীর বিটপীকুল নিদ্রা নাহি যায়.....৪৫
আন্ধার ঘরে টুকি দিল ছোট্ট দুটি ভাই.....৪৬
ইচক দানা বিচক দানা দানার উপর দানা.....৪৭
ছোটোখাটো ঢক চেহারা দুই ভাইয়ের দশ বউ.....৪৮
তাকে যখন এড়াতে চাও আমি তখন আসি.....৪৯
কচি সবুজ ছুকরিগুলা শ্যামল দেশের মাইয়া.....৫০
প্রথমে কাটিয়া ফেলো দুইখানি কাঁধ.....৫১
গুণ্ঠন খুলিয়া যদি হও অগ্রসর.....৫২
সারি সারি দাঁতের নারী বিচিত্র চেহারা.....৫৩
ডাকি তাকে নাই বলিয়া অতছ যে আছে.....৫৪

১.

মরিচ তো নয় ঝাল লাগে
খাইতে তবু ভাল্লাগে!
নুন লাগে না চুন লাগে
ঠোঁট কাটে না খুন লাগে!
ফুল না তবু ঘ্রাণ আছে
খাইলে পরে প্রাণ নাচে!
রঙ্গে রসে লাল ঠোঁটে
মিঠা কথার ফুল ফোটে!
রৈদ লাগে না ছেমায় বাস
হালের ফালে দেয় না চাষ ।
বাঁশের খুঁটি বাঁশের ঘর
তারই মধ্যে বউ আর বর ।
বউ সোয়ামী দুই বাজা
তবুও দুয়াই রানি রাজা ।
ফুল ফোটে না রাজমূলে
ফল ফলে না মার কূলে ।
তবুও এমন এক ফসল
ফুল সে তো নয়, নয় বা ফল ।
ফলতে থাকে বারো মাস
বারুজীবীর মুখে হাস ।
মানুষও খায়, খায় ছাগল
জ্ঞানীও খায়, খায় পাগল ।
রাজা প্রজা ধনীর মুখ
এক ফসলেই রঙিন সুখ ।
বল্ কী এটা, বাঁশ না ঘাস?
ফুল ধরে না ফল ধরে না
ফলতে থাকে বারোমাস!
বলতে যদি পারো তবে
একবারেই পিএইচডি পাস!!!

রচনা: ১৯ মে ২০২৩

২.

তেল চুকচুক কৃষ্ণ নারী মুখখানি তার গোল্লুগাল
মধ্যিখানে খাড়া ঝুঁটি, আগায় কী ফুল তপ্ত লাল!
মুখের ভেতর যতই ভর পুষ্করিণীর ঠান্ডা জল
আসর ঘিরে বাসর হলে শীতল নারী চায় কে বল্!
রাগে নারীর মেজাজ গরম চান্দিতে আগুন জ্বলে
ফুঁ যদি দাও ঠান্ডা হতে ঘিত্ত পড়ে অনলে!
ফুঁয়ের বাতাস ফুরুক ফুরুক ফুরফুরাফুর ফুরুক্কু
ঘুরতে থাকে উড়তে থাকে সাপের লাহান উড়ুক্কু ।
এক আসরে যতেক পুরুষ কালা নারীর কবলে
তাম্রকূটের নেশায় মজে ধূম্রসাপের ছোবলে ।
নারী তো নয় তবুও নারী আছে মুখমণ্ডলে
পাইলে হাতেই চুমায় তারে, নামটি তাহার কে বলে?

রচনা: ২১ মে, ২০২৩

৩.

আগায় ছিদ্র পাছায় ছিদ্র ছিদ্র আরও বেশি
ছিদ্রচেতন যে মহাজন সে-ই তো ছিদ্রান্বেষী!
এক দুয়ারি ছয় জানালায় সপ্ত রানির মুখ
দুই ঠোঁটে দাও ফুৎকারে দম ফুলিয়ে নিজের বুক!
ফুটোয় ফুটোয় বান্ধে বাসা সুরের কবুতর
এক ফুটাতে বাইরে উড়াল অন্য ফুটোয় ঘর ।
ঘর বানাতে হয় সে খুঁটি নাওয়ে লগির ঠেলা
চোর ছ্যাচড়ের পিঠটা ফাটায় পায় যদি এত্তেলা ।
দোলনা হইতে কয়বরে তার আছে ব্যবহার
পচন ধরে, ঘূণেও খায়, সৃষ্টি ও সংহার ।
কিন্তু যাহার ছিদ্রে ছিদ্রে ফুঁ দিয়া দেয় দম
সেই জিনিসের নাইরে মরণ দম মারো দম দম!
কলির কেষ্ট হও যদি তার নামটি বলা চাই
অঞ্চলে মুখ লুকিয়ে হাসে ধন্যি কালের রাই ।

রচনা: ২১ মে, ২০২৩